ধর্ম ও বিজ্ঞান: সংঘাত-সমন্বয়ের রণনীতি-রণকৌশল

মোঃ জানে আলম

ধর্ম ও বিজ্ঞানের স্বরূপ

মূলগতভাবে ধর্ম একটি তাত্ত্বিক বিষয়। জগত ও জীবন সৃষ্টি সম্পর্কে কিছু তাত্ত্বিক ধারণা এবং সে তত্ত্বে বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে কিছু আচার-আচারণ-উপাসনা ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান নিয়েই ধর্ম। ধর্মীয় তাত্ত্বিকতার ভিত্তি হল বিশ্বাস এবং একমাত্র বিশ্বাস। বিজ্ঞানও প্রথমত একটি তাত্ত্বিক বিষয়। তবে সে তত্ত্বের ভিত্তি বিশ্বাস নয়। বিজ্ঞানের যে তত্ত্ব, তা গড়ে ওঠে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও প্রমাণের উপর ভিত্তি করে। ধর্মে প্রথমে বিশ্বাস, অতঃপর বিশ্বাসের আলোকে জগত ও জীবনকে ব্যাখ্যার চেষ্টা এবং তাকে প্রমাণের প্রয়াস যা একটি অসম্ভব প্রকল্পও বটে। পক্ষান্তরে বিজ্ঞানে আগে পর্যবেক্ষণ, ধারণা ও পরীক্ষণ এর মাধ্যমে চুড়ান্ত প্রমাণ, অতঃপর তত্ত্বের নির্মাণ। প্রয়োগের মাধ্যমে প্রমাণ করা ব্যতীত কোন তত্ত্বের স্থান বিজ্ঞানে নেই। পক্ষান্তরে ধর্মীয় তত্ত্বের প্রয়োগ ও প্রমাণের কোন সুযোগ নেই। ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে মানুষ কিছু ধর্মীয় উপাসনা-আচার আচরণ-আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে এবং এ বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা নীতি-নৈতিকতা নিয়ন্ত্রন করে নারী-পুরুষ এর সম্পর্ক, নারীর অধিকারের মাত্রা, নারী স্বাধীনতা, বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক ইত্যাদি একান্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়, কোন কোন ক্ষেত্রে সামাজিক জীবনাচরণ ধর্মীয় নৈতিকতার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়ে থাকে, যে সবের আবার মূল লক্ষ্য হল পরকাল এবং পরলৌকিক মোক্ষলাভ। এর বাইরে ধর্মের আর কোন ইহজাগতিক ভূমিকা নেই। যদিও গোঁড়া ধর্মপন্থীরা তাদের ধর্মের মৌলিক বিধি-বিধানকে সমাজ ও রাষ্ট্রে অবিকলভাবে প্রয়োগ করতে চায়। তারা রাষ্ট্রের ও সমাজের সকল দিগনির্দেশনার জন্য ধর্মের আদিম ধারণা বা বিধি-বিধানকে অনুসরণ করে। মুসলিম মৌলবাদীরা সমাজ ও রাষ্ট্রের তাবৎ সমস্যা সমাধানের জন্য তাদের পবিত্র ধর্ম-গ্রন্থ কুরআন ও সুন্নাহের উপর নির্ভর করতে চায়। কুরআন যেহেতু ঐশীগ্রন্থ এবং হযরত মুহাম্মদ(দঃ) আল্লাহের প্রেরিত পুরুষ, সেহেতু কুরআন ও সুন্নাহের (নবীর জীবনাচরণ) বাহিরে কোন দিগনির্দেশনা মুসলমানেরা মানতে নারাজ। ইহুদী মৌলবাদীরা তোরাহ্ এর আক্ষরিক ব্যাখ্যার বাইরে বিন্দু-বিসর্গ যেতে প্রস্তুত নয়। খৃষ্টান মৌলবাদীরা প্রায় সকল প্রশ্নে বাইবেলের শিক্ষা অভ্রান্ত বলে দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করে। এ লক্ষ্যে তারা দেশে দেশে সশস্ত্র সংগ্রাম করছে, নিতান্ত সন্ত্রাসী কায়দায়। বিজ্ঞানের তত্ত্বের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা প্রযুক্তি আধুনিক মানুষের ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক এমনকি রাষ্ট্রীয় জীবনকে আজ নিয়ন্ত্রণ করছে। আজ বিশ্ব মানবগোষ্ঠীর জীবনের হেন ক্ষেত্র নেই যেখানে প্রযুক্তি প্রবেশ করেনি। মজার ব্যাপার হল, এ প্রযুক্তি ব্যবহারে ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ ভেদে কোন বৈষম্য নেই, নেই কোন অনীহা। আধুনিক যুগে এমন কোন গোঁড়া ধর্মবেত্তা পাওয়া যাবে না, যিনি বিজ্ঞানের আবিস্কার নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার থেকে নিজেকে বিরত রেখেছেন। তাই বিজ্ঞান সর্বজনীন এবং ধর্মনিরপেক্ষ। ইসলামী বিজ্ঞান, খৃষ্ট্রীয় বিজ্ঞান, হিন্দু বিজ্ঞান, বৌদ্ধিক বিজ্ঞান কিংবা ইহুদী বিজ্ঞান বলে কোন বিজ্ঞান হতে পারেনা। কিন্তু পৃথিবীতে বিদ্যমান কোন ধর্মই সর্বজনীন নয়। বরং কোন এক ধর্মের বিশ্বাস অন্য ধর্মের বিশ্বাসকে নাকচ করে দেয় অর্থাৎ বিশ্বাসের দিক থেকেও তারা পরস্পর বিরোধী। এখানেও মজার ব্যাপার হল, বিশ্বাস যার একমাত্র ভিত্তি, সে আবার অন্যের বিশ্বাসকে নাকচ করার চেষ্টা করে যুক্তি দিয়ে। পৃথিবীতে ধর্মের সংখ্যা সহস্রাধিক। কোন ধর্মই তার শ্রেষ্ঠত্ব এবং খাটিত্বের দাবী পরিহার করেনি। বলা বাহুল্য পরস্পর বিরোধী সকল ধর্ম সত্য হতে পারেনা। ধর্ম ও বিজ্ঞানের এ বিরোধ বা দ্বন্দ্ব সহজাত। বিজ্ঞান ও ধর্মের উৎপত্তির ইতিহাসে এর বীজ নিহিত।

সমাজতত্ত্ব ও দর্শনের ছাত্র মাত্রেই জানেন, সামাজিক সত্ত্বা, সামাজিক চেতনার নির্ধারক। অর্থাৎ বিদ্যমান সামাজিক সত্ত্বার উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে সামাজিক চেতনা। সমাজ-সভ্যতার ক্রম বিকাশের ধারা সম্পর্কে যাদের ন্যুনতম জ্ঞান আছে, তারা জানেন মধ্যযুগীয় সমাজ বাস্তবতায় যখন উৎপাদন-সম্পর্ক ছিল সামন্তবাদী ভূ-স্বামী ও ভূমি দাস, তখন মানুষ প্রকৃতির উপর ছিল নিতান্ত অসহায়। অবিকশিত উৎপাদিকা শক্তির ফলে খেয়ালী প্রকৃতির কাছে মানুষের অসহায়ত্বের কারণে মানুষ অলৌকিক শক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করে নানা বালা মুসিবত থেকে মুসকিল আসান হওয়ার উপায় অনুসন্ধান করতে গিয়েই প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণকারী কোন পরম শক্তির আশ্রয় প্রার্থণা, অতঃপর পরমাত্মায় বিশ্বাস স্থাপন করে। এ বিশ্বাস থেকেই ধর্মের উৎপত্তি। এভাবে মধ্যযুগীয় সামন্তবাদী যুগে ধর্ম মূল সামাজিক চেতনার স্থান দখল করে নেয়। কিন্তু লোহার আবিস্কার ও ব্যবহার, বিশেষভাবে জেম্স ওয়াটের বাস্পীয় ইঞ্জিন আবিস্কার উ□পাদিকা শক্তির বিকাশে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করে। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের সাথে বিদ্যমান উ□পাদন সম্পর্কের দ্বন্দের ফলে সামন্তবাদী সমাজ ভাঙ্গার ঘন্টা বেঁজে ওঠে। সামন্তবাদী সমাজের গর্ভে জন্ম নেয় পুঁজিবাদী সমাজ। অন্ধ নিয়তি বিশ্বাসের বিপরীতে কাযর্-কারণ সম্পর্ক মানুষের চিন্তায় আসে। ধর্মীয় বিশ্বাসের বিপরীতে যুক্তি চিন্তা তথা বিজ্ঞান ক্রমানয়ে সামাজিক মূল চেতনার জায়গা দখল করতে থাকে। এভাবে বৈজ্ঞানিক চেতনার বিকাশের সাথে ধর্মীয় চেতনার বিলয় ঘটতে থাকে। ধর্ম ও বিজ্ঞানের বিকাশ যেন ব্যাস্ত আনুপাতিকথ একটি বাড়লে অন্যটি কমবে। কিন্তু প্রশ্ন হল, আজ একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের এ চরম উৎর্ষতার যুগেও ধর্ম এখনো কিভাবে দোর্দণ্ড প্রতাপে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিরাজ করছে? এ প্রশ্নের জবাবও আমাদের খুঁজতে হবে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার কারণের মধ্যে।

মানুষের চেতনার সামাজিক ভিত্তি

উপরোক্ত বিষয়ে দার্শনিক প্রত্যয় হল- সামাজিক সত্তার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে সামাজিক চেতনা। সামাজিক সত্ত্বা হল একটি সমাজের সামগ্রিক আবহ, যার মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশকেও যোগ করা যায়। মানুষের ব্যক্তি চেতনার সমন্বিতরূপ হল একটি জনগোষ্ঠির সামাজিক চেতনা, যদিও ব্যক্তি চেতনা সবসময় সামাজিক চেতনার প্রতিনিধিত্ব করেনা। ব্যক্তি চেতনার প্রাথমিক ভিত্তি হল পারিবারিক আবহ। একটি শিশু জন্মের প্রাক্কালে যেমন তার আত্মজেরা শিশুর উপযোগী পরিধেয় বস্ত্র তৈরী করে রাখে, ঠিক তেমনি তার জন্মের পূর্বে তার পরিবারে তার জন্য বিশ্বাস-চেতনা-মূল্যবোধের একটি অদৃশ্য অবয়ব তৈরী হয়ে তাকে, জন্মের পর তৈরী পোশাকের মত ধীরে ধীরে নবজাতকও সে অবয়বে প্রবেশ করে। অতঃপর ক্রমে যখন এ শিশু আরো বেড়ে ওঠতে থাকে এবং সে ক্রমে পরিবারের গণ্ডি পেরিয়ে সামাজিক আঙ্গিনায় প্রবেশ করে, তখন মানুষের সঙ্গবদ্ধ আচার-আচরণ তার উপর প্রভাব ফেলে। পারিবারিক চেতনার অদৃশ্য অবয়বের মত যে সমাজের সে বাসিন্দা, সে সমাজও তার জন্য চিন্তা-চেতনা-মূল্যবোধের একটি অবয়ব আগাম তৈরী করে রাখে, তাকে পরিবর্তন নয়, তার মধ্যেই সে নিজেকে মানিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ধর্মীয় বিশ্বাস একান্ত ব্যক্তি বিশ্বাস হলেও জন্ম লগ্ন থেকে প্রত্যেক ধর্ম ধর্মানুসারীদের গোষ্ঠীবদ্ধ আচার-আচরণের কারণে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এভাবে মানুষের চিন্তা চেতনা একটি সামাজিক সত্ত্বার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এখন আমরা যদি বিশ্বপ্রেক্ষিতে বিশ্ব মানব সমাজ ও সভ্যতার বিকাশের দিকে তাকাই, তাহলে আমরা দেখব এ বিকাশ নানা ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক কারণে সমসত্ত্ব নয়, বরং নিদারুন অসম। বিশ্বের কোন কোন দেশে সমাজ ব্যবস্থা এখনো মধ্যযুগে অবস্থান করছে শুধু চিন্তা চেতনাগত ভাবে নয়, উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রেও। ফলত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা যেখানে পশ্চাদপদ, সেখানে মানুষের চিন্তা চেতনা ও পশ্চাদপদ হতে বাধ্য। বিজ্ঞানের আধুনিক প্রযুক্তি যদিও সে সকল সমাজে পৌছে গেছে উপছে পড়া তত্ত্বানুসারে, কিন্তু বিজ্ঞানের দর্শন সেখানে এখনো জায়গা করে নিতে পারেনি। নির্মম ফলশ্র“তিতে ঐ সকল পশ্চাদপদ সমাজ

এখনো মধ্যযুগীয় চিন্তা-চেতনা-মূল্যবোধ এর জন্ম, বিকাশ ও লালনের উর্বর ক্ষেত্র হয়ে আছে। এখানে পাল্টা প্রশ্ন আসতে পারে, যে সকল দেশ, বিশেষভাবে মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্মৃদ্ধ দেশগুলো, প্রযুক্তিগতভাবে তাদের দেশ ও সমাজকে অনেক এগিয়ে নিয়ে গেছে, তথাপিও সে সকল দেশ এখনো ধর্মভিত্তিক দেশ হিসাবে কিভাবে টিকে আছে এবং ধর্মীয় চেতনা ও মূল্যবোধ কিভাবে তাদের সমাজের এখনো মূল চেতনার জায়গা দখল করে আছে?

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, ধর্ম একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক স্বয়ং রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় এ প্রতিষ্ঠান তার তাত্ত্বিক ভিত্তিকে সুরক্ষার জন্য সর্বগ্রাসী প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে অনুক্ষণ। কারণ এ সকল রাষ্ট্র এখনো জনগণের রাষ্ট্র হয়ে ওঠতে পারেনি। বরং বিভিন্ন শেখ পরিবার দীর্ঘদিন যাবত তাদের মৌরসী তালুক হিসাবে এ সকল রাষ্ট্রের জনগণকে শাসন-শোষণ করে যাচ্ছে এবং সে ক্ষেত্রে তাদের অব্যর্থ হাতিয়ার হল ধর্ম। তাই বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার এ যুগে, পেট্রোডলারের বদৌলতে বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সে সব দেশে পৌছলেও বিজ্ঞানের মূল যে দর্শন, তাকে সেখানে পৌছতে দেওয়া হচ্ছে না। রাষ্ট্রযন্ত্র সেখানে অতন্দ্র প্রহরীর মত পাহারা দিচ্ছে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও মূল্যবোধকে। এর বিরুদ্ধে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় একটু রা করলে একেবারে শিরোচ্ছেদ। তাই সমাজের অবকাঠামো আধুনিক হলেও তার উপরিকাঠামো, প্রশাসন, বিচার, শিক্ষা ইত্যাদি রয়ে গেছে এখনো মধ্যযুগীয় এবং যতদিন তা ধরে রাখা যাবে, ততদিনই নিরাপদ ও নিরঙ্কুশ থাকবে শেখ পরিবারগুলোর স্বার্থ। তবে বলাবাহুল্য, এ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হলেও চিরস্থায়ী হবে না।

মানবগোষ্ঠীকে এগিয়ে যেতেই হবে

এ কথা আজ বলা বাহুল্য যে, বিশ্ব মানবগোষ্ঠী, তার সমাজ ও সভ্যতা, জন্মলগ্নের অবস্থায় দাঁড়িয়ে নেই। তার ক্রম বিকাশ মানব সভ্যতাকে বিকাশের এক অভাবনীয় পর্যায়ে উপনীত করেছে। মানুষের এ অগ্রযাত্রা অপ্রতিরোধ্য এবং তার গন্তব্য নিঃসীম। প্রকৃতিকে জয় করে মানুষের জীবনকে আরো সম্ভাবনাময়, সহজ ও সুখপ্রদ করতে হলে আমাদের এগিয়ে যেতেই হবে। সেক্ষেত্রে বিশ্বপরিমণ্ডলের তুলনায় আমাদের মত পশ্চাদপদ দেশগুলোর এগিয়ে যাওয়ার তাগিদত অপরিহার্য। কারণ বিশ্ব প্রেক্ষিতে আমরা ইতোমধ্যেই অনেক পিছিয়ে আছি। আমাদের কাঙ্ক্ষিত অগ্র যাত্রার যে রথ, নিঃসন্দেহে তা তো ধর্ম নয়, বিজ্ঞান। কিন্তু নির্মম বাস্তবতা হল ধর্ম নামক বিষয়টি আমাদের মত পশ্চাদপদ দেশে তথা সমাজে শুধু নিরেট বাস্তবতা নয়, মানুষের জীবনাচরণের অন্যতম নিয়ন্তাও। এখানেই প্রশ্নটা আসে, তাহলে আমরা কিভাবে এগুবো। দুই রথে দু'পা রেখে এগুনো যেমন যাবে না, তেমনি ধর্মীয় রথে ওঠে মোক্ষলাভের পরম চিন্তায় যে বিশাল জনগোষ্ঠী আত্মনিমগ্ন হয়ে আছে, তাদের কিভাবে বিজ্ঞানের রথে সওয়ার করা যাবে? এ পথ কি সংঘর্ষের না সমন্বয়ের?

ধর্ম ও বিজ্ঞানঃ সংঘর্ষ না সমন্বয়?

আধুনিক ধর্মবেত্তারা যতই প্রানান্তকর প্রয়াস পাক না কেন, বিজ্ঞান দিয়ে ধর্মকে প্রমাণ করা কিংবা বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে যৌক্তিক সমন্বয় সোনার পাথরবাটির মত অসম্ভব একটি প্রকল্প। কারণ বিষয়গতভাবে দু'টির তাত্ত্বিক ভিত্তি সম্পূর্ণ বিপরীত এবং একটি অপরটিকে নাকচ করে। তথাপিও সমাজের সর্ববৃহৎ অংশের মধ্যে ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা-মূল্যবোধের উপস্থিতিকে অস্বীকার করা যায় না। বিজ্ঞানের আবিস্কার সকল প্রকার প্রযুক্তি ব্যবহারে আধুনিক ধর্মবেত্তাদের বিন্দুমাত্র আপত্তি না থাকলেও এবং অবলীলাক্রমে কি পারিবারিক কি সামাজিক জীবনে তারা এ সকল প্রযুক্তির সুফল ভোগ করলেও বিজ্ঞানের দর্শন যখন তাদের হাজার বছরের লালিত বিশ্বাসে

আঘাত হানে, তখন তারা রে রে করে তেড়ে আসে। বিপন্ন করে তুলে সে দর্শনের আবিস্কর্তাকে। তাই বিজ্ঞানের এ উৎকর্ষতার বেদীমূলে অনেক বিজ্ঞানীকে আত্ম বলি দিতে হয়েছে যার ভুরি ভুরি নজির ইতিহাসে বিদ্যমান। তাহলে কি ধর্মের সাথে সমন্বয় করে এগুনোর প্রয়াস পেতে হবে? তা কিভাবে সম্ভব? বিজ্ঞান যে সত্য আবিস্কার করেছে তাকেত অস্বীকার করা যায়না। সমন্বয় করলেত দেয়া-নেওয়ার প্রশ্ন আসবে। এখানে দেওয়া নেওয়ার সুযোগ কোথায়?

রণনীতি ও রণকৌশলগত একটি প্রকল্পের প্রস্তাবনা

ধর্মকে বিজ্ঞানের সাথে সমন্বয় যেমন একটি অসম্ভব প্রকল্প, তেমনি তার অবস্থান ও আমজমগণের মানসে তার সুদৃঢ় শিকড়কে অস্বীকার করে জনগণের মানস পরিবর্তনের প্রয়াসও প্রায় অসম্ভব একটি ধারণা। তাই সমাজ তথা রাষ্ট্রকে এগিয়ে নিতে হলে, যারা আদপেই সমাজকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিতে চান, তাদের কিছু রণকৌশল অবলম্বন করতে হবে। এক্ষেত্রে লক্ষ্যটা (রণনীতি) স্থির করতে হবে দু'টি প্রেক্ষিত মাথায় রেখে,

এক) জ্ঞানগত দিক তথা দার্শনিক প্রেক্ষিত,

দুই) সমাজ ও রাষ্ট্র উন্নয়নমূলক প্রেক্ষিত.

জ্ঞানগত বা দার্শনিক প্রেক্ষিত

এখানে মূল প্রশ্নটা জ্ঞান ও দর্শনের। জ্ঞানগতভাবে সত্যের সাথে মিথ্যা, কিংবা ভুলের সাথে শুদ্ধের যেমন কোন সমন্বয় বা সমঝোতা চলেনা এবং এ জাতীয় প্রশ্নই বরং অবান্তর, ঠিক তেমনি ধর্ম তথা বিশ্বাসের সাথে বিজ্ঞানের সমন্বয় বা সমঝোতার কোন সুযোগ নেই। এখানে সাংঘর্ষিক হলেও বিজ্ঞানের চর্চা অব্যাহত থাকবে। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিস্কার বা অগ্রগতি যদি প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসের ভীতে আঘাতের পর আঘাত হানে, কারো তথাকথিত ধর্মীয় অনুভূতিতে লাগে এবং কারো আজন্ম লালিত বিশ্বাসে ভীত উপড়েও ফেলে, তবুও বিজ্ঞানের আবিস্কারকে অস্বীকার করা কিংবা ধর্মের আলোকে তাকে জায়েজ করে নেওয়ার কোন সুযোগ নেই এবং তার প্রয়োজনও নেই। বরং তা করতে গেলে মানুষের চিন্তা সীমাবদ্ধ ও বুদ্ধি আড়ষ্ট হয়ে পড়বে। বিজ্ঞানের যে অভিযাত্রায় তাকে বাঁধাহীনভাবে চলতে দিতে হবে জ্ঞানের রাজ্যে। তার অগ্রগতির মাধ্যমে অজ্ঞনতার আধাঁর ধীরে ধীরে তিরোহিত হবে।

আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত

আমরা পুর্বেও আলোচনা করেছি যে, বিজ্ঞানের এ চরম উৎকর্ষতার যুগেও পৃথিবীর সর্বাংশে আর্থ-সামাজিক বিকাশ সমভাবে ঘটেনি। একই ভাবে বিজ্ঞান ও জ্ঞানের বিকাশেও আছে মাত্রাগত তারতম্য। এখন জ্ঞানগত দিক থেকে আমরা যেমন বিজ্ঞান ও ধর্মের সাথে কোনরূপ সমন্বয় সমঝোতা ছাড়া এগুতে চাই, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে তা করতে গেলে এগুনোই যাবেনা। সমাজে বিদ্যমান সামাজিক চেতনা, তা যত পশ্চাৎপদ হউক না কেন, তাকে এক ধাক্কায় গুড়িয়ে দেওয়া যাবে না। বরং তা করতে গেলে হিতে বিপরীত হবে প্রতিক্রিয়ায় নতুন

করে চাঙ্গা হবে ধর্মীয় বিশ্বাস। আবার সমাজের প্রত্যেক মানুষকে বৈজ্ঞানিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ বা সচেতন করে আমরা উন্নয়ন অগ্রগতির পথে এগুবো, সে ধারণাও অবাস্তব। এখানেই আসে ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের সমন্বয়ের প্রশ্নটি। তবে এ সমন্বয় অবশ্যই বিজ্ঞানের কোন সত্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে নয়, তা প্রকাশে "সহনীয় সীমারেখা" মেনে চলে। কথাটি একটু খোলাসা করি। বিজ্ঞানে এমন কিছু সত্য আছে বা আবিস্কৃত হবে, যা ধর্মের অস্থিত্বের উপর সরাসরি আঘাত হানবে। সে সকল সত্য প্রকাশে আমাদের যে কৌশল নিতে হবে, তাহলো যুক্তি-তর্ক, কার্য-কারণ চর্চা বা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমজনতাকে ক্রমান্বয়ে প্রস্তুত করে ধীরে ধীরে নব আবিস্কৃত সে সত্যকে তার সামনে তুলে ধরা, যাতে আজন্ম বিশ্বাস আচমকা ভেঙ্গে গেল বলে তাদের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে না পড়ে। এ পদ্ধতিটাকে আমি ''সত্য প্রকাশের সহনীয় মাত্রা'' বলতে চাচ্ছি, যদিও আমার জানা নেই এ জাতীয় কোন প্রত্যয় আগে কেহ ব্যবহার করেছেন কিনা। আধুনিক ধর্ম-কেত্তারা তার বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখার শেষ চেষ্টা হিসাবে যতই বিজ্ঞানের আলোকে ধর্মকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পাক না কেন, বিষয়টাকে ধর্তব্যের মধ্যে না এনে আমাদের কেবল বৈজ্ঞানিক সত্যটাকে আমজনগণের কাছে তুলে ধরতে হবে, যুক্তি-তর্ক ও কার্য-কারণ ব্যাখ্যা করে। ধর্মের বিরুদ্ধে সরাসরি কোন মন্তব্য করার প্রয়োজন নেই। তা আপনি-আচরি শুকিয়ে যাবে। কিন্ত এক্ষেত্রেও আমাদের অবিচল থাকতে হবে রণনীতিতে, অর্থাৎ আমাদের লক্ষ্যে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি আমজনগনকে বিজ্ঞানমনস্ক করার একটি সচেতন প্রয়াস চালাতে হবে বিরামহীনভাবে। তাতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অগ্রগতির সাথে সাথে বৈজ্ঞানিক চেতনার বিকাশের পথও হবে সুগম। এ পদ্ধতিতে অনুশীলনের ফলে এমন একটি সময় আসবে, তখন বিজ্ঞানের সাথে ধর্ম, যুক্তির সাথে বিশ্বাসের এবং কার্য-কারণের সাথে অলৌকিকত্বের সমন্বয়ের প্রশ্নটা অবান্তর হয়ে ওঠবে। তবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা বা উদ্যোগ ছাড়া এ প্রয়াসকে সহজতর করবে। এ এক সাংস্কৃতিক লড়াই যাকে যুগপৎ অনেক ফ্রন্টে যুদ্ধ করে যেতে হবে। এর সহজ ও সংক্ষিপ্ত অন্য কোন বিকল্প নেই।

মোঃ জানে আলম, গবেষণা, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান বিষয়ক সম্পাদক, গণফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটি। ইমেইল- jalamadv@yahoo.com